৭

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রচিন্তা

ভূমিকা: সমাজ, রাষ্ট্র এবং অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে কার্ল মার্কসকে সমাজতন্ত্রবাদের মূল প্রবক্তা হিসেবে গণ্য করা হয়। পুঁজিবাদী শোষণ নির্ভ উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সমাজ-ব্যবস্থার বিপরীতে কার্ল মার্কস দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ধারার উপর প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র মতবাদ উদ্ভাবন করেন। তাঁর এ মতাদর্শ মার্কসবাদ (Marxism) নাম খ্যাত। ধনতান্ত্রিক সমাজের শোষণ, নির্যাতন উপলব্ধি করে কার্ল মার্কসের আগে রবার্ট ওয়েন, চার্লস ফুরিয়ে প্রমুখ দার্শনিকগণ ধনতান্ত্রিক সমাজের অবসান ঘটিয়ে শোষণহীন শ্রমিক রাজের কল্পনা করেছিলেন। কিন্তু কোন্ পথে বাস্তবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে তার কোন প্রকার সঠিক রূপরেখা প্রদানে উক্ত দার্শনিকগণ ব্যর্থ হয়েছিলেন। এ কারণে তাঁরা 'কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদী (Utopian Socialist) হিসেবে খ্যাত। বস্তুত: কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদীদের কল্পনা নির্ভর সমাজতন্ত্র কার্ল মার্কসের হাতে বাস্তব ও প্রয়োগযোগ্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পেয়েছিল। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মার্কসের চিন্তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে রাশিয়ার ভ্লাদিমির ইলিস লেনিন বিংশ শতাব্দীর শুরুতে (১৯১৭) তৎকালীন জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিক মেহনতী জনতার সমন্বয়ে গঠিত বৈপ্লবিক শক্তির দ্বারা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে বিশেষত: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর (১৯৪৫) পূর্ব ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৯ সালে মাওজেডং-এর নেতৃত্বে চীন দেশে বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান অধ্যায় উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর আলোড়ন সৃষ্টিকারী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ

- ❑ *পাঠ-১ : কাল-মার্কস;*
- ❑ *পাঠ-২ : লেনিন;*
- ❑ *পাঠ-৩ : যোসেফ স্ট্যালিন;*
- ❑ *পাঠ-৪ : মাওজেডং।*

পাঠ-১

কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ❑ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রবক্তা কার্ল মার্কসের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তার বর্ণনা দিতে পারবেন;
- ❑ সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থার ব্যাখ্যা দিতে পারবেন;
- ❑ কার্ল মার্কসের চিন্তার মূল্যায়ন এবং তার বিরুদ্ধে সমালোচনা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

ভূমিকা: সমাজ, রাষ্ট্র এবং অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে কার্ল মার্কসকে সমাজতন্ত্রবাদের মূল প্রবক্তা হিসেবে গণ্য করা হয়। পুঁজিবাদী শোষণ নির্ভর উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সমাজ-ব্যবস্থার বিপরীতে কার্ল মার্কস দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ধারার উপর প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র মতবাদ উদ্ভাবন করেন। তাঁর এ মতাদর্শ মার্কসবাদ (Marxism) নামে খ্যাত।

ধনতান্ত্রিক সমাজের শোষণ, নির্যাতন উপলব্ধি করে কার্ল মার্কসের আগে রবার্ট ওয়েন, চার্লস ফুরিয়ে প্রমুখ দার্শনিকগণ ধনতান্ত্রিক সমাজের অবসান ঘটিয়ে শোষণহীন শ্রমিক রাজের কল্পনা করেছিলেন। কিন্তু কোন্ পথে বাস্তবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে তার কোন প্রকার সঠিক রূপরেখা প্রদানে উক্ত দার্শনিকগণ ব্যর্থ হয়েছিলেন। এ কারণে তাঁরা 'কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদী' (Utopian socialist) হিসেবে খ্যাত। বস্তুত: কাল্পনিক সামজতন্ত্রবাদীদের কল্পনা নির্ভর সমাজতন্ত্র কার্ল মার্কসের হাতে বাস্তব ও প্রয়োগযোগ্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পেয়েছিল। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মার্কসের চিন্তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে রাশিয়ায় ভ□াদিমির ইলিস লেনিন বিংশ শতাব্দীর শুরুতে (১৯১৭) তৎকালীন জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিক মেহনতী জনতার সমন্বয়ে গঠিত বৈপ্লবিক শক্তির দ্বারা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে বিশেষত: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর (১৯৪৫) পূর্ব ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৯ সালে মাউ সেতুঙ-এর নেতৃত্বে চীন দেশে বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ভাবে বিশ্বের এক বৃহৎ অংশ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপ নেয়। তবে এখানে উল্লেখ করা যায় যে, ১৯৯০ সালের পর থেকে রাশিয়াসহ পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সমাজতান্ত্রিক আদর্শ পরিত্যাগ করে এবং ধনতান্ত্রিক ধারার রাষ্ট্র নির্মানের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এমনকি কট্টরপন্থী হিসেবে পরিচিত চীনও কম্যুনিষ্ট আদর্শের ভেতর ব্যক্তি মালিকানা ও বহুজাতিক যৌথ মালিকানার দ্বার উন্মোচন করে দেয়। বর্তমান অধ্যায়ে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর আলোড়ন সৃষ্টিকারী দার্শনিক কার্ল মার্কসের চিন্তাধারা উপস্থাপন করা হবে।

কার্ল মার্কস: জন্ম, শিক্ষা ও কর্মজীবন

কার্ল মার্কসের জন্ম জার্মানীতে এক ইহুদী পরিবারে। ছাত্রাবস্থায় তিনি হেগেলের দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হলেও পরবর্তীতে হেগেলের চিন্তার শুধু প্রগতিশীল অংশটুকুই গ্রহণ করেন। উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করলেও তাঁর চরম ও বৈপ্লবিক তৎপরতা ও চিন্তা সেই কাংখিত পদের বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। পরে তিনি প্রুশিয়ার একটি চরমপন্থী সংবাদপত্রে যোগদান করেন এবং কৃষক অভ্যুত্থানে জড়িয়ে যান। এমতাবস্থায় তাঁকে প্রুশিয়া থেকে বহিষ্কার করা হলে তিনি প্রথমে প্যারিস ও পরে ইংল্যান্ড গমন করেন। প্যারিসে তিনি এক শিল্পপতির পুত্র ফ্রেডারিক এঙ্গেলস এর সাহচর্য লাভ করেন এবং তাঁরা একত্রে সাম্যবাদী তৎপরতা ও পুস্তক রচনায় মনোনিবেশ করেন। ১৮৪৮ সালে তাঁদের যৌথ কাজ বিখ্যাত *'কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো'* শিরোনামে প্রকাশিত হয়। মার্কস তৎকালীন ইউরোপীয় সমাজে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক শোষণের উপর গবেষণা

শুরু করেন এবং এঙ্গেলস-এর সহায়তায় ১৮৬৭ সালে '*ক্যাপিটাল*' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। পরবর্তীতে এই পুস্তকের আরও দু'টি খন্ড প্রকাশিত হয়। এ ছাড়াও '*দি ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকনমি,*'*দি সিভিল ওয়ার হন ফ্রান্স*' প্রভৃতি পুস্তক রচনার মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর কালজয়ী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। ১৮৮৩ সালে লন্ডনে তিনি মারা যান।

কার্ল মার্কসের দর্শন

এ যাবৎ কালের সকল প্রকার সমাজ ব্যবস্থা বিশেষ করে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার শোষণ, নির্যাতন ও বঞ্চনার বিপরীতে শোষণহীন সাম্যবাদী আদর্শের বাস্তবসম্মত সমাজের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রদানের লক্ষ্যে মার্কস তাঁর চিন্তা ও দর্শনকে এগিয়ে নেন। তাঁর এই দর্শন মার্কসবাদ (Marxism) নামে খ্যাত। বস্তুত মার্কসবাদ একটি ব্যাপক ও বিস্তৃত মতবাদ। তবে সংক্ষেপে মার্কসবাদকে মোটামুটি পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করা যায়, যথা:

● দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ● ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ● শ্রেণী সংগ্রাম তত্ত্ব ● উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব ● সাম্যবাদ।

নিম্নে সংক্ষেপে এগুলো ব্যাখ্যা করা গেল:

● দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ: সমাজ পরিবর্তন এবং বিকাশের মূলে কোন্ শক্তি কাজ করে থাকে এটি দার্শনিকদের কাছে একটি অনন্ত জিজ্ঞাসা। সমাজ বিকাশের অন্তর্নিহিত প্রবণতা উদঘাটন করার প্রশ্নে মার্কস তাঁর শিক্ষক হেগেলের দ্বান্দ্বিক সূত্রকে গ্রহণ করেন এবং নিজস্ব ভঙ্গিতে তা ব্যক্ত করেন। হেগেলের মতে দ্বন্দ্বই হলো মূল কথা। তাঁর মতে অগ্রগতি বা বিবর্তন প্রকৃতিস্থ সহজাত ধারার ফলশ্রুতিতে পরস্পরবিরোধী শক্তির সংঘাতের ফলে সূচিত হয়। তিনি বলেন, বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ের (Thesis) মধ্যে স্বভাবজাত একটি বিরোআত্মক ধারা কাজ করে (Anti Thesis)। আর এ দু'টি ধারার সংঘাতের ফলে সৃষ্টি হয় সংশ্লেষণ (Synthesis)। তবে প্রকারান্তরে উক্ত সংশ্লেষণ নিজে পরক্ষণেই আবার প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ Thesis এ পরিণত হয়। এ ভাবে চক্রাকারে সমাজ ও ইতিহাস এগিয়ে যায়। হেগেল বলেন এ সবই ঘটে ভাবের সাথে ভাবের (Ideas) সংঘাতের ফলে। কিন্তু মার্কস হেগেলের নিকট দ্বান্দ্বিক সূত্রের জন্য ঋণী থাকলেও দ্বন্দ্বের অভ্যন্তরস্থ শক্তি-অর্থাৎ ভাবকে (Ideas) প্রত্যাখ্যান করেন এবং বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিকোন থেকে বিশ্লেষণ করে বলতে চান যে, ভাব নয় বস্তুই হলো মূল শক্তি। বস্তুগত সংঘাতের ফলেই সমাজ-ইতিহাস এগিয়ে যায়। বলাবাহুল্য, মার্কসের এ ব্যাখ্যা ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ নামে পরিচিত।

বস্তুগত সংঘাতের ফলেই সমাজ-ইতিহাস এগিয়ে যায়

● **দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ এবং ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা :** মার্কস এবং এঙ্গেলসের মতে মানুষের সমাজ ও ইতিহাসের মূল শক্তি হচ্ছে বস্তু। তাঁরা তাই বস্তুকে মানুষের জীবনধারনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত করেছেন। তাঁদের মতে অর্থনৈতিক ও উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তিতেই (Basic structure) মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও ধর্মীয় ইত্যাদি সম্পর্ক (Super structure) নির্ধারিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রত্যেক সমাজেই 'উৎপাদনের শক্তি' এবং 'উৎপাদন সম্পর্কের' মধ্যে সংঘাত শুরু হয়।

মানুষের জীবনধারনের জন্য চাই উৎপাদন। এ জন্য প্রথমেই প্রয়োজন উৎপাদনের উপরকরণ। আর এ সব কার্যক্রমই হলো উৎপাদনের শক্তি (ফোর্সেস অব প্রডাকশন)। উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় যে উৎপাদন সংঘটিত হয় তা বন্টনের প্রশ্নে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। মার্কস এ সম্পর্ককে বলেছেন 'উৎপাদন সম্পর্ক' (প্রোডাকশন. রিলেশন)। প্রত্যেক সমাজেই 'উৎপাদনের শক্তি' এবং 'উৎপাদন সম্পর্কের' মধ্যে সংঘাত শুরু হয়। মার্কস মনে করেন যুগে যুগে দেখা গিয়েছে সমাজের শক্তিমানেরা উক্ত বন্টন প্রক্রিয়ায় অন্যায়ভাবে প্রকৃত উৎপাদককে (মেহমতি মানুষ) বঞ্চিত করে থাকে। এমতাবস্থায় বঞ্চিতরা মার্কসের ভাষায় 'শোষিতরা শোষকদের বিরুদ্ধে' সংগঠিত হয়।

ফলে সৃষ্টি হয় সংঘাত বা দ্বন্দ্ব। এ অনিবার্য দ্বন্দ্বের ফলে সৃষ্টি হয় নতুন সমাজ, আর নতুন উৎপাদন সম্পর্ক। মার্কস মনে করেন, এ ভাবে সমাজ কাঠামোর মৌলিক ক্ষেত্রে (Basic structure) পরিবর্তন ঘটার সাথে সাথে উপরিকাঠামোয় (Super Structure) এ পরিবর্তন ঘটে। এ ভাবেই সমাজ ও ইতিহাস এগিয়ে যায়।

মার্কস আরও মনে করেন আদিকাল থেকে অদ্যাবধি দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় পাঁচটি পর্যায়ে (স্তরে) মানুষের সমাজ ও ইতিহাসের পরিবর্তন ঘটেছে। যথা:-

- আদি সাম্যবাদ (যখন মানুষের মধ্যে কোন প্রকার উদ্ভাবনী শক্তি ছিল না, ছিল না ব্যক্তিগত সম্পত্তির বোধ।)
- দাস সমাজ (দাস – দাস মালিক)
- সামন্ত সমাজ (ভূমিহীন – ভূস্বামী)
- ধনাতান্ত্রিক সমাজ (শ্রমিক – পুঁজিপতি)
- সমাজতান্ত্রিক সমাজ (সর্বহারা শ্রমিক – ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিপতি শ্রেণী) যা চুড়ান্তভাবে সাম্যবাদী বা শ্রেণীহীন সমাজে উন্নীত হবে।

'মানব জাতির জ্ঞাত ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস।

শ্রেণী সংগ্রাম তত্ত্বঃ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ইত্যাদি আংগিকে না দেখে বরং 'শ্রেণী' শব্দটিকে মার্কস অর্থনৈতিক সম্পর্কের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে সমাজ বিকাশের প্রতিটি ধাপে 'উৎপাদন সম্পর্কের' ভিত্তিতে শ্রেণী নির্ধারিত হয়ে থাকে। তিনি আরও বলেন যে, শ্রেণী যেখানে থাকবে সেখানে থাকবে শ্রেণী শোষণ। আর এজন্যই অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে শ্রেণী সচেতনতা, শ্রেণী সংগঠন ও শ্রেণী সংগ্রাম। মার্কস এবং এঙ্গেলস তাঁদের বিখ্যাত (১৮৪৮ সালে প্রকাশিত) কমিউনিষ্ট ইশতেহারে উল্লেখ করেন যে, 'মানব জাতির জ্ঞাত ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস।' কিভাবে শ্রেণীর সৃষ্টি হলো- এ প্রশ্নের উত্তরে মার্কস বলেন যে, আদিতে সমাজে যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব ছিল না, তখন শ্রেণীরও অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু পরবর্তীতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি উদ্ভবের ফলে সমাজ বিভক্ত হয়ে যায়। একদিকে থাকে সম্পত্তির মালিক শ্রেণী অন্যদিকে থাকে মালিকানা বিহিন শ্রেণী। বলাবাহুল্য, পরবর্তীতে বিকাশের প্রতিটি স্তরেই সম্পত্তির মালিকগণ (শোষক শ্রেণী) মালিকানা বিহিন (শোষিত) শ্রেণীকে শোষণ করেছে। প্রতিটি স্তরেই

শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এ প্রতিবাদী সংঘাতই হলো শ্রেণীর দ্বন্দ্ব বা সংগ্রাম। শ্রেণী সংগ্রামের ফলেই সমাজ কাঠামোতে পরিবর্তন এসেছে বলে মার্কস দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। মার্কস আরও মনে করতেন রাষ্ট্র, প্রশাসন, আইন কানুন এ সবই স্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার স্বরূপ। তাই শ্রেণীর উত্থানের সাথে রাষ্ট্রের উত্থান অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। বিকাশের এক পর্যায়ে (সাম্যবাদী) যখন আর শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকবে না তখন রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানটি অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে এবং বিলুপ্ত হবে।

উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্বঃ উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব মার্কসের এক উল্লেখযোগ্য তত্ত্ব। এ তত্ত্বের মধ্য দিয়ে মার্কস পুঁজিবাদী শোষণের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা প্রদান করতে চেয়েছেন। মার্কস মনে করেন শ্রমশক্তিই (প্রকৃত পুঁজি) কোন কিছুর মূল্য (Value) সৃষ্টি করে থাকে। তিনি মেশিন বা অন্য কিছুকে হিমায়িত পুঁজি বলে মনে করেন যা মূল্য সৃষ্টির জন্য মূখ্য নয়। পুঁজিপতিগণ শ্রমিকদেরকে ইচ্ছামত উৎপাদন কাজে ব্যবহার করলেও তাদের প্রকৃত প্রাপ্য দেয় না। ফলে শ্রমিকদের অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হতে থাকে। শ্রমিক শ্রমদান করে যে মূল্য (Value) সৃষ্টি করে থাকে তার অধিকাংশ পুঁজিপতিরা অন্যায়ভাবে নিয়ে নেয়। এ ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত মূল্য বলতে বোঝায় সেইটুকু যে টুকু শ্রমিককে প্রদত্ত মুজুরীর অতিরিক্ত। উদাহরণ স্বরূপ, পুঁজিপতি শ্রমিককে দিয়ে ১৬ ঘন্টা খাটিয়ে যে মূল্য সৃষ্টি করে নেয় তার পরিমাণ ধরা যাক ২০০.০০ টাকা, কিন্তু মালিক উক্ত শ্রমিককে উক্ত ১৬ ঘন্টার জন্য প্রদান করে মাত্র ৫০.০০ টাকা যা উক্ত শ্রমিকের ১৬ ঘন্টার শ্রমের সৃষ্ট মূল্য নয় বরং মাত্র ৪ ঘন্টার

পরিশ্রমের মূল্য। এ ক্ষেত্রে বাঁকী ১২ ঘন্টা সময়ের সৃষ্ট শ্রমের মূল্য নিয়ে নেয় পুঁজিপতি। এই হলো উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্বের সহজ ব্যাখ্যা।

সাম্যবাদ: মার্কস মনে করতেন দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় ইতিহাসের চলমানতা অব্যাহত থাকবে ততক্ষণ, যতক্ষণ না শোষণহীন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্কস বিশ্বাস করতেন শ্রমিক শ্রেণীর সচেতনার জন্য ধনতান্ত্রিক সমাজের শোষণের বিরুদ্ধে বিপ্লব সংগঠিত হবে। এ বিপ্লবের ফলে রাষ্ট্রযন্ত্র শ্রমিক শ্রেণীর হস্তগত হবে। উৎপাদনের উপকরণসমূহের সুপরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে শোষক শ্রেণীর উচ্ছেদ ঘটিয়ে শ্রমিক শ্রেণী সমাজতান্ত্রিক সমাজকে উত্তরোত্তর পরিপক্কতার দিকে নিয়ে যাবে এবং এক পর্যায়ে সমাজ থেকে শোষণ চিরতরে নির্মূল হবে, শ্রেণীর অস্তিত্ব এবং রাষ্ট্র বিলুপ্ত হবে। উৎপাদনের পরিমাণ এতো বৃদ্ধি পাবে যে মানুষ তখন প্রত্যেকে নিজের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু অন্যের সাথে বিনা সংঘাতেই পেয়ে যাবে। আর এ চূড়ান্ত পর্যায়ই হলো সাম্যবাদী পর্যায়।

মানুষ তখন প্রত্যেকে নিজের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু অন্যের সাথে বিনা সংঘাতেই পেয়ে যাবে।

মার্কসের বিরুদ্ধে সমালোচনা

প্রিয় শিক্ষার্থীগণ, এ পর্যায়ে আমরা অতি সংক্ষেপে মার্কসের তত্ত্বের বিরুদ্ধে সমালোচনাগুলো বর্ণনা করতে পারি। এ কথা সত্য কার্ল মার্কস উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেভাগে যে সমাজ কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে তত্ত্ব প্রদান করেছিলেন বর্তমান বিশ্বে সেই বাস্তবতার পরিবর্তন ঘটেছে। মার্কসের তত্ত্বের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটেছিল। পূর্ব ইউরোপ, চীনসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গিয়েছে। আবার সে সাথে বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে উক্ত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর অধিকাংশ স্থানে পুনরায় পুঁজিবাদী ধারায় ফিরে আসার প্রচেষ্টাও দেখা গিয়েছে। শ্রম ঘন্টা এখন ১৬ ঘন্টার পরিবর্তে ৮ ঘন্টায় স্থির হয়েছে। সাধারণ শ্রমিক, নারী শ্রমিক ও শিশু শ্রমিকের জন্য স্থানীয় এবং আর্ন্তজাতিকভাবে বিভিন্ন অধিকার সনদ তৈরী হয়েছে। শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা জোরদার হয়েছে। শ্রমিকদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ ধনতন্ত্রের স্বার্থেই বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চলছে। এ সবই বর্তমান বাস্তবতা। উপরোক্ত বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে কার্ল মার্কসকে মূল্যায়ন করা সহজ কাজ নয়। তবে প্রথাগতভাবে তার তত্ত্বের বিরুদ্ধে কিছু সমালোচনা উত্থাপন করা যায়।

- মার্কস ইতিহাসের বিবর্তনের ধারায় কেবলমাত্র অর্থনৈতিক সম্পর্ককে মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে একপেষে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। তার প্রদত্ত তত্ত্বে মৌল কাঠামো ও উপরিকাঠামোর ধারণা পুরোপুরি সত্য নয়। মানুষের সামগ্রীক আচরণে সব সময়ই এবং সর্বত্র জ্ঞাতে অজ্ঞাতে শুধুমাত্র বস্তুই কাজ করে এমন কথা বাস্তবতার প্রতিফলন নয়। কারণ অ-বস্তুগত দিকও মানব আচরণকে প্রভাবিত করে থাকে।

- তিনি শ্রেণী সংগ্রামের উপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করে বাস্তবতার প্রতি কিছুটা অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন। সমাজের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তর প্রক্রিয়ায় শ্রেণী চেতনা হয়তো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ বা একচ্ছত্র ভূমিকা রাখে, এমন কথা বলা যায় না। সামন্ত সমাজ থেকে ধনতান্ত্রিক সমাজ উত্তরণে শ্রেণী সংগ্রামের চেয়ে বরং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত আবিষ্কারই বেশী অবদান রেখেছে বলে অনেকে মনে করেন।

- মার্কস মানব চরিত্র বিশ্লেষণে হয়তো কিছুটা অতি-আশাবাদী ছিলেন। মানুষের লোভী ও স্বার্থপরতার চরিত্রটি তিনি তেমন আমল দেন নি। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় এমনকি সমাজতান্ত্রিক সমাজে সর্বহারার একনায়কত্বের নামে একটি বিশেষ সুবিধাভোগী বিলাসী শাসক শ্রেণীর একনায়কত্বের রূপ নিয়েছিল।

- বর্তমানে ধনতান্ত্রিক সমাজ যদিও চূড়ান্ত বিকাশ লাভ করেছে, তবুও সেখানে দ্বন্দ্ব বা সংঘাত তেমন স্পষ্ট নয়। উপরন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজ নিজেকে পরিবর্তিত অবস্থায় খাপ

খাইয়ে নেবার জন্য কাঠামো ও কার্যগত পরিবর্তন এনে টিকে থাকার মতো পাকাপোক্ত অবস্থানের দিকে ধাবিত হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা, বেকার ভাতা এর উদাহরণ।

- রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসের বক্তব্য একপেশে মনে হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে রাষ্ট্র দুর্বল না হয়ে বরং আরও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল।

তবে উপরোক্ত সমালোচনার পরও বলা যায় কার্ল মার্কসের চিন্তাধারা বিশ্বে সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী মতবাদ। তার তত্ত্ব বাস্তবেও প্রয়োগ যোগ্যতা পেয়েছে। ধনতান্ত্রিক বিশ্বের নগ্ন শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর এ তত্ত্ব ছিল এক জোরালো ও বিজ্ঞান সম্মত বিশ্লেষণ ও প্রতিবাদ।

সারকথা

কার্ল মার্কস রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক তেজদীপ্ত নাম। উনবিংশ শতাব্দীর অমানবিক ধনতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে তিনি শ্রমজীবি মানুষের স্বার্থে শোষণ মুক্তির এক বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব উপহার দিয়ে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তাঁর একাডেমিক পান্ডিত্য সর্বজন স্বীকৃত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে (✓) টিক চিহ্ন দিন।

১। কাল মার্কস কোন দেশে জন্ম গ্রহণ করেন ?
(ক) ফ্রান্স; (খ) জার্মানী;
(গ) ইংল্যান্ড; (ঘ) রাশিয়া।

২। কম্যুনিষ্ট মেনিফেষ্টো রচনা করেছেন-
(ক) কার্ল মার্কস; (খ) হেগেল;
(গ) কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলস; (ঘ) প্লেটো।

৩। মার্কস ও এঙ্গেলস কর্তৃক রচিত ক্যাপিটাল পুস্তকটি কত খন্ডে বিভক্ত ?
(ক) ২ খন্ডে বিভক্ত; (খ) ৩ খন্ডে বিভক্ত;
(গ) ৫ খন্ডে বিভক্ত; (ঘ) কোন খন্ডে বিভক্ত নয়।

সঠিক উত্তর মালা - ১। খ ২। গ ৩। খ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ

১। উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব কি ?
২। হেগেলের দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের সাথে মার্কসের দ্বন্দ্ব তত্ত্বের পার্থক্য কোথায় ?
৩। মার্কসকে কেন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের জনক বলা হয় ?
৪। ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা কি ?
৫। শ্রেণী সংগ্রাম কি ?
৬। রাষ্ট্র ও শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্ক কি?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। সমালোচনাসহ মার্কসের তত্ত্বের মূল বিষয়গুলোর বর্ণনা দিন।

পাঠ - ২

ভ্লাদিমির লেনিন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি -

- ভ্লাদিমির লেনিনের জীবন কথা বলতে পারবেন;
- ভ্লাদিমির লেনিনের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

রাশিয়ার ভলগা নদীর তীরে, সিমবির্স্ক শহরে ইউলিয়ানভ পরিবারে ১৮৭০ সালের ১০ এপ্রিল রাশিয়ার বিপ্লবী মতাদর্শের প্রতিভাবান উত্তরসূরী, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা, বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নির্মাতা ভ্লাদিমির ইলিচ ইউলিয়ানভ লেনিন জন্মগ্রহণ করেন।

ভ্লাদিমির লেনিন জীবনের প্রথম পর্বে (১৮৮৭ - ৮৮) ইউরোপীয় বিপ্লবী চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন। বিশেষত: কার্ল মার্কস রচিত পুঁজি গ্রন্থটি পাঠের পর নিজেকে তিনি একজন মার্কসবাদী হিসেবে আবিষ্কার করেন। ১৮৯১ সালে সেন্ট পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি আইনে স্নাতক ডিগ্রী অর্জনের পর ভলগা অঞ্চলের সামারা শহরে দুবছর আইন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। ১৮৯৩ সালে লেনিন সেন্ট পিটার্সবুর্গে উদীয়মান মার্কসবাদী রাজনৈতিক চক্রে যোগদান করেন এবং ১৮৯৫ সালে সেখানকার শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি আন্দোলনে সম্পৃক্ত হন। এ সব আলোচনা চক্রে এবং অংশ গ্রহণের সময় লেনিন সহজবোধ্য দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝাতেন কিভাবে মার্কবাদকে প্রযোগ করা উচিত বিপ্লবীদের জীবনে, পুঁজিবাদ ও জার সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করা দরকার কি পদ্ধতিতে। এই বিপ্লবী তৎপরতার অভিযোগে লেলিন তাঁর অপর এক বিপ্লবী সহকর্মী ও পরবর্তীতেম স্ত্রী নাদেজা ক্রোপস্কায়ার সাথে ১৫ মাস কারাবরণ এবং ১৯০০ সাল অব্দি সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত জীবন কাটান। অত:পর লেনিন ইউরোপ প্রবাসে চলে যান এবং সেখানকার বিপ্লবী চক্রে যোগদানপ র্বক 'ইস্ক্রো' নামে পত্রিকা প্রকাশে মনোনিবেশ করেন। লেনিনের উদ্যোগ ও পরিচালনায় রাশিয়ায় গড়ে উঠে ইস্ক্রার সহযোগী গ্রুপ ও পাঠক চক্র। পত্রিকাটি সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে সহায়তা করে। নির্বাসনের দ্বিতীয় পর্বে ১৯০২ সালে লেলিন রচনা করেন তাঁর সাংগঠনিক মতবাদ সম্বলিত গ্রন্থ 'হোয়াট ইজ টু বি ডান'? এই গ্রন্থে লেনিন শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠন, পেশাদার বিপ্লবী ধারণা, বিপ্লবীদের কৌশল প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এ সব ধারণার অনেকগুলোই লেনিন উদ্ভাবন করেন মার্কস-এঙ্গেলস্-এর চিন্তাধারাকে রাশিয়ার সমাজ জীবনে খাপ খাইয়ে নেয়ার প্রয়োজনে।

তাঁর পরিকল্পিত বিপ্লবী তৎপরতার লক্ষ্যে লেনিন সর্বহারা শ্রেণীর অগ্রণী অংশ হিসেবে পেশাদারী বিপ্লবীদের সংগঠিত করেন যারা সুশৃঙ্খলভাবে জার সরকারের পতনের মাধ্যমে শ্রমিক রাজ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবেন। লেনিনের মতে, শ্রেণী সচেতন পেশাদার বিপ্লবীরা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার নীতিতে সংগঠিত হয়ে শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী সচেতনতা, শৃঙ্খলা ও বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলবে এবং মার্কসবাদী দর্শন অনুযায়ী এক একটি নির্দিষ্ট মূহুর্তে করণীয় বিষয়াদি ব্যাখ্যা করবে। পেশাদার বিপ্লবীদের প্রতি লেনিনের অতিরিক্ত গুরুত্বারোপের বিষয়টি মন:পুত ছিল না রুশ পেটি-বুর্জোয়া সংগঠন সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির অনুসারীদের কাছে। লেনিন সমর্থকদের কাছে তাদের মতবিরোধ তীব্রতর হয়ে

উঠলে ১৯০৩ সালে দলের দ্বিতীয় কংগ্রেসে দল দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। এ ভাবে দলীয় কংগ্রেসে লেলিনের নেতৃত্বাধীন বলশেবিক (যার বাংলা অর্থ সংখ্যগরিষ্ঠ) অল্প সংখ্যাগরিষ্ঠতার ব্যবধান বিরোধী অংশ মেনশেভিকরা কৃষকদের (সংখ্যালঘু) পরাজিত করে। তা সত্ত্বেও পেশাদারী বিপ্লবীদের ভূমিকা অস্বীকার করে মেনশেভিকরা কৃষকদের মনে করত বিপ্লবের চালিকা শক্তি এবং চেষ্টা করত জার সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এদেরকে অগ্রভাগে নিয়ে আসতে। দলের এই অভ্যন্তরীণ সংকটের রাজনীতি লেলিনের পরবর্তী রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অনেক প্রাধান্য বিস্তার করে।

১৯০৫ সালে বিপ্লবের পর রাশিয়ার টালমাটাল দিনগুলোতে লেলিন রাশিয়ায় ফিরে আসেন এবং মাত্র দু'বছরের মাথায় প্রবাসে পারি দিতে বাধ্য হন। নির্বাসিত জীবনে ইউরোপে কঠিন সময় অতিবাহিত করতে হয় লেনিনকে। সে সময় রাশিয়ায় বিপ্রবের ভবিষ্যৎ নিয়ে মেনশেবিকদের সাথে মতবিনিময় সত্ত্বেও লেনিনের অনেক অনুগত মেধাবী অনুসারী তাঁকে পরিত্যাগ করে। দলের বিপ্লবী চিন্তাধারার কর্ণধার লেনিন ১৯০৯ সারে রচনা করেন 'মেটারিয়ালিজম এন্ড ইস্পিরিও ক্রিটিসিজম' গ্রন্থ। এতে তিনি প্রকৃতি বিজ্ঞানের সর্বশেষ বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসবাদী দর্শন ও জ্ঞানতত্ত্বের স্বরূপ তুলে ধরেন। তারও তিন বছর পর প্রাগে দলীয় এক কনভেনশনে মেনশেভিক-বলশেভিক ভাঙ্গন চূড়ান্ত হয়ে পড়ে। ১৯১৪ সালে লেনিন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনালগ্নে যুদ্ধকে বুর্জোয়াদের অভ্যন্তরীণ লড়াই হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং তাঁর কর্মীদেরকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লাই-এ অবতীর্ণ হওয়ার আহবান জানান।

১৯১৭ সালের মার্চ মাসে সংগঠিত বিপ্লবে জার সরকারের পতন ঘটলে লেনিন গোপনে জার্মানী হয়ে পেট্রোগার্ড (সেন্ট পিটার্সবুর্গের নতুন নামকরণ) পৌঁছান। জোসেফ স্ট্যালিনসহ স্থানীয় বলশেভিক নেতৃবৃন্দ তখন লেনিনকে জানান যে অভ্যুত্থানের সোভিয়েত শ্রমিক ও সেনা সদস্যরা বুর্জোয়া অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সমর্থন যুগিয়েছে। এটি অবহিত হয়ে লেলিন তার তাৎক্ষণিক বক্তৃতায় (ইতিহাসে যা 'এপ্রিল থিসিস' নামে খ্যাত) দলের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের আহবান জানান। লেনিন যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, বলশেভিক বিপ্লবের পর একমাত্র শ্রমিকদের সমন্বয়ে গঠিত সোভিয়েতগুলো (পরিষদসমূহ) রুশ শ্রমিক ও কৃষকদের আশা - আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম। পরবর্তীতে জুলাই মাসে শ্রমিকদের একটি ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর লেলিন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার থেকে লুকিয়ে আগস্ট - সেপ্টেম্বর মাসে ফিনল্যান্ড অবস্থান করেন। সেখানে অবস্থানকালে 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' নামে বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। এই বইতে তিনি শ্রেণী সংগ্রাম, রাষ্ট্র ও বিপ্লবের সমস্যাবলী, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে জনগণের ভূমিকা, সাম্যবাদী সমাজ নির্মাণ, জনগণের সাথে পার্টি ও নেতৃত্বের পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেন। উপরন্তু, মার্কসের শ্রেণী সংগ্রাম তত্ত্বকে কিছুটা পরিশীলিত করে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদকে সমাজবিকাশের দু'টো পৃথক পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করেন লেনিন। মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্বে লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' বইটি এক মৌলিক অবদান হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবের পর ৭ নভেম্বর লেনিন সোভিয়েত সরকার প্রধান হিসেবে কাউন্সিল অব পিপলস কমিশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। দায়িত্বভার গ্রহণের পর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে 'ধীরে চলো নীতি' গ্রহণ করেন তিনি। বিপ্লবের ফসল সোভিয়েতসম হের ক্ষমতাকে দেশের অভ্যন্তরীণ ও বাইরের শত্রুর হাত থকে রক্ষার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। একই লক্ষ্যে তিনি জার্মানীর সাথে ব্রেষ্ট-লিটোস্ক শান্তি চুক্তিতে উপনীত হন। তাঁর এই ধীরে চলার নীতি অবশ্য ১৯১৮-২১ সালে দেশে গৃহযুদ্ধ ডেকে আনে। লিও ট্রটস্কির সমর্থন ও রেড আর্মির ক্ষিপ্রতায় লেলিন সোভিয়েত ইউনিয়নের গৃহযুদ্ধে বিজয়ী হন। যুদ্ধের পর লেনিন নয়া অর্থনৈতিক নীতিমালার মাধ্যমে দেশকে বাজার অর্থনীতি ও বহুবাদী সমাজে ফিরিয়ে আনেন এবং একইসাথে দলসমূহের

মাঝে ভাঙ্গনের ধারাকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে কমিউনিষ্ট পার্টির একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

লেনিন ১৯২৪ সালের ২১ জানুয়ারী তাঁর কর্মবহুল জীবনের অবসান ঘটিয়ে মস্কোর উপকণ্ঠে গর্কি গ্রামে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মার্কস-এঙ্গেলস্ এর সাম্যবাদী মতবাদের অনুসারী লেনিন ছিলেন রুশ ও আন্তর্জাতিক সর্বহারা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত ও রুশ কমিনিষ্ট পার্টি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা। মার্কসবাদী দর্শনের বিশ্লেষণে লেনিন কর্তৃক সম্পাদিত সংযোজনসমূহের সমন্বয়ে ৪৫ খন্ডে প্রকাশিত হয় 'লেনিন রচনা সমগ্র'। এসব রচনায় লেনিন অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ, দর্শন, সংস্কৃতি, বিপ্লবের রণকৌশল ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অধিকাংশ মার্কসবাদীদের কাছে মার্কসবাদ বলতে মার্কসবাদ-লেলিনবাদের সমন্বিত মতবাদকেই বুঝানো হয়। নব্বই-এর দশকের শুরুতে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙ্গন ও সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের পতনের মধ্যে দিয়ে লেনিনের রাষ্ট্র দর্শনের ব্যাপক বিপর্যয় ঘটে।

সারকথা

কাল মার্কসের সাম্যবাদী চিন্তাধারা বলশেভিকদের ক্ষমতায় আরোহন ও তা অক্ষুন্ন রাখতে সহায়তা করে। মার্কসবাদী দর্শনকে রাশিয়ার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বিধানে লেনিনের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সমন্বিত চিন্তাধারা পরবর্তীতে গ্রামসী, জোসেফ স্ট্যালিন, লিও ট্রটস্কি ও মাও সেতুঙ এর মতো বিপ্লবী নেতৃত্বের সৃষ্টি করে। অধিকাংশ বিশ্লেষকের মতে লেনিন ছিলেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে (✓) টিক চিহ্ন দিন।

১। কোন গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে লেনিন মার্কসবাদী হয়ে উঠেন?
ক) ষ্টেট এন্ড বিভ্যুলেশন;
খ) দাস কেপিটাল;
গ) ইম্পেরিয়ালিজম : দ্য হায়েষ্ট ষ্টেজ অব কেপিটালিজম;
ঘ) হোয়াট ইজ টু বি ডান?

২। সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সম্পর্ক স্তর পুস্তকটির লেখক কে?
ক) ভি আই লেনিন;
খ) কার্ল মার্কস;
গ) এম এন রায়;
ঘ) জোসেফ স্ট্যালিন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। পেশাদার বিপ্লবী অর্থে লেনিন কি বুঝাতে চেয়েছেন?
২। বলশেভিক ও মেনশেভিকদের মতাদর্শগত পার্ককের কারণ কি?
৩। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে লেনিনের মূল্যায়ন কি ছিল?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। মার্কসবাদী দর্শনকে লেনিন কিভাবে রাশিয়ার সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেন?

সঠিক উত্তর

১। খ, ২। ক

পাঠ - ৩

যোসেফ স্ট্যালিন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি -

- ❑ যোসেফ স্টালিনের সংগ্রামী জীবন সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ❑ স্ট্যালিনের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ধরন ও তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার বর্ণনা করতে সক্ষম হবেন।

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মানে এবং একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে জোসেফ ভিসারিওনোভিচ ষ্ট্যালিন (১৮৭৯-১৯৫৩) দীর্ঘতম সাফল্যের ইতিহাস রচনা করে গেলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপ তথা বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে তিনিই সম্ভবত সবচে' শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতা ও ব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রকৃত নাম ইউসিফ ভিসারিওনোভিচ সোসো, স্ট্যালিন নামটি তিনি ১৯১০ সালে 'লৌহমানব' অর্থে ধারণ করেন। তিনি ১৮৭৯ সালেরর ২১ শে ডিসেম্বর জর্জিয়ার অন্তর্গত গৌরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন পেশায় মুচি। তাঁর পিতা মাতা কেউই রুশ ভাষা জানতেন না। স্টালিন গোরী চার্চ স্কুলে পড়াশুনাকালে (১৮৮৮ - ৯৪) পড়াশুনার মাধ্যম হিসেবে রুশ ভাষা শেখেন। একজন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসেবে স্ট্যালিন বিদ্যালয়ে পুরো বৃত্তি ভোগ করেন। পুরোহিত্য অর্জনের উদ্দেশ্যে পড়াশুনাকালে স্ট্যালিন তৎকালীন নিষিদ্ধ সাহিত্য তথা মার্কসের 'পুঁজি' অধ্যায়নের মাধ্যমে রুশ সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার গোড়াঁ সমর্থকে পরিণত হন। এই অপরাধে ১৮৯৯ সালে বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হতে তাঁকে। তিনি টি 'বিল-ীসি রেল কর্মচারীদের মাঝে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির একজন প্রচারক হিসেবে তাঁর পেশা শুরু করেন। ১৯০২ সালে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে এবং পরবর্তী বছর তিনি প্যারিস গমন করেন। ১৯০২-১৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে স্ট্যালিন কারাবাস যাপন করেন, সাতবার নির্বাসিত হন এবং ছয়বার পালিয়ে বেড়ান। সরকার কেবল একবার তাঁকে ১৯১৩-১৭ সাল অব্দি লম্বা সময় নির্বাসনে রাখতে সক্ষম হয়।

জার শাসনামলের শেষভাগে (১৯০৫-১৭) স্ট্যালিন ছিলেন লেনিনের রাজনৈতিক অনুসারী মাত্র। তিনি সব সময়েই কমিউনিষ্ট পার্টির বলশেভিক অংশের সমর্থক ছিলেন। দলের প্রতি তাঁর অবদান ছিল বাস্তবমুখী। ১৯০৭ সালে দলের জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনে টি 'বিল-ীসিতে এক ব্যাংক ডাকাতির ঘটনায় জড়িত হন তিনি। একই বছর তিনি লন্ডনে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলনেও উপস্থিত ছিলেন। ১৯১২ সালে তিনি বলশেভিক পার্টির সংখ্যালঘু জাতি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করলে লেনিন তাঁকে বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে জাতি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করলে লেনিন তাকে বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে দলের শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃত্বে তুলে নিয়ে আসেন। লেনিনের অনুরোধক্রমে ১৯১৩ সালে তিনি ভিয়েনায় অবস্থানকালে 'মার্কসিজম এন্ড দ্য ন্যাশনালিটি কোশ্চেন' গ্রন্থটি রচনা করেন। প্রন্থটি প্রকাশিত হবার আগেই স্ট্যালিনকে সাইবেরিয়া নির্বাসনে যেতে হয়। ১৯১৭ সালে মার্চ বিপ্লবের পর স্যালিন পেট্রোগ্রাডে ফিরে আসেন এবং প্রাভদা পত্রিকার সম্পাদনা কাজ হাতে নেন। অক্টোবর বিপ্লবের সময় স্ট্যালিন পেট্রোগ্রাডে ফিরে আসেন এবং প্রাভদা পত্রিকার সম্পাদনার কাজ হাতে নেন। অক্টোবর বিপ্লবের পর স্ট্যালিন পেট্রোগ্রাডে গরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং লেনিন সরকারের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসংক্রান্ত কমিশন নিযুক্ত হন। জাতীয়তাবাদ বিষয়ের একজন বিদগ্ধ ব্যক্তি হিসেবে লেনিন তাঁকে উক্ত বিষয়ে প্রধান কমিশনারের দায়িত্ব দেন। বিপ্লব পরবর্তী গৃহযুদ্ধের সময় স্ট্যালিন অন্যান্য বিপ্লবীদের নিয়ে লেনিনকে একান্ত সহযোগিতা প্রদান

করেন। স্ট্যালিন কমান্ডার হিসেবে ইয়ুদেনিং -এর শ্বেতবাহিনীর হাত থেকে পেট্রোগ্রাডকে রক্ষা এবং জেনারেল ভেনিকিনের হাত থেকে জারিৎসিনকে উদ্ধার করেন। দলের অভ্যন্তরে এসময় স্ট্যালিন তাঁর সাংগঠনিক তৎপরতার মাধ্যমে নিজস্ব অবস্থানকে সুদৃঢ় করেন এবং প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পন্ন করেন। তিনি ১৯১৯-২৩ সাল অব্দি রাষ্টীয় নিরাপত্তা কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯২২ সালে রুশ কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হন। এ সময় স্ট্যালিন দলকে তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতার একটি সাংগঠনিক ভিত্তিতে পরিণত করেন। এ সময় কোন কোন ক্ষেত্রে অল্প গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে লেনিনের সাথে তাঁর মতপার্থক্য ঘটে।

লেনিনের মৃত্যুর আগে স্ট্যালিনের ব্যক্তিত্বে কিছু সমস্যা প্রত্যক্ষ করে লেনিন তাঁকে 'রাজনৈতিক আপদ' হিসেবে করেন। লেনিন তাঁর রাজনৈতিক মুল্যায়নে স্ট্যালিনের প্রতি কিছুটা সন্দিহান হয়েছিলেন যে দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তিনি যথার্থভাবে তাঁর দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন কি-না। তিনি স্ট্যালিনকে একবার 'বদমেজাজী' হিসেবে আখ্যা দিয়ে তাঁর অপসারণ চেয়েছিলেন। স্ট্যালিনের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল যে তিনি জিনোভিয়েভ ও কামেনভের সহায়তায় লেনিনের তৎপরতাকে প্রতিহত করতে সক্ষম হন। ১৯২৪ সালে লেলিনের মুত্যুর পর স্ট্যালিন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। এতে লেনিনের পছন্দসই উত্তরসূরী ট্রটস্কির সাথে স্ট্যালিনের দ্বন্দ্ব চরমে উঠে। তাঁকে অপসারণের লক্ষ্যে স্ট্যালিন নিকোলাই বুখারিনের সাথে সমঝোতায় পৌছান এবং লেনিনের অনেক বক্তব্যকে সুকৌশলে ব্যাখ্যা ও প্রচারণার মাধ্যমে তাঁর প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করেন। এসময় 'লেনিনবাদের ভিত্তি' 'লেনিনবাদের সমস্যা' প্রভৃতি পুস্তকাদিও তিনি রচনা করে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধান নেতা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হন।

১৯২৮ সাল থেকে স্ট্যালিন 'এক দেশ ভিত্তিক সমাজতন্ত্র' নীতিমালা গ্রহণ করেন। এ সময় মার্কসীয় ধারার বিশ্ব সাম্যবাদী বিপ্লবের পরিবর্তে শুধুমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন তিনি। স্ট্যালিন উদ্ভাবিত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এই কর্মসূচী ছিল লেনিন ও ট্রটস্কি প্রচলিত 'স্থায়ী বিপ্লব' নীতির পরিপন্থী। তাঁর এই একটি দেশে এককভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকালে কৃষি উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দিলে স্ট্যালিন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন এবং সার্বিয়া অঞ্চলে কৃষি কার্যক্রম স্বয়ং তদারকি করেন। ১৯২৯ সালের শেষভাগে কৃষিতে তিনি 'যৌথ খামার ব্যবস্থা চালু করলে লক্ষ লক্ষ কৃষক স্থানান্তরিত হয় এবং হাজার হাজার কৃষক মৃত্যুবরণ করে। ১৯৩০ এর দশকে স্ট্যালিন শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচারণায় নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে সফল হন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রশ্চাৎপদ রিপাবলিকসমূহ শিল্পের শক্তি হিসেবে বিকশিত হয়।

১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ের স্ট্যালিন তাঁর শাসনের পক্ষে ব্যাপক রাজনৈতিক প্রচারণা ও শক্তি প্রয়োগ শুরু করেন। রাজনৈতিক নিপীড়ন, ধর-পাকড়, উচ্ছেদ ইত্যাদির ফলে বহু পরিবার ভীতিকর পরিস্থিতির শিকার হয়। স্ট্যালিন তাঁর ইতিপূর্বেকার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের অনেককেই রাষ্ট্র বিরোধী আখ্যায়িত করে মৃত্যুদন্ড প্রদান করেন। অসংখ্য দলীয় সদস্য, শিল্প শ্রমিক ও সেনাবাহিনী কর্মকর্তা 'অতিশয় ভীতিকর' সময়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং নিকিতা ক্রুশ্চেভ ও লিওনিদ ব্রেজনেভ এর মত নেতৃত্ব বিকাশে সহায়তা করে। স্ট্যালিনিজমের ভীতিকর প্রভাব এবং কেজিবিসহ গোয়েন্দা পুলিশের তৎপরতা রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বিপজ্জনক পর্যায়ে ঠেলে দেয়। ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার প্রক্রিয়ায় স্ট্যালিন ১৮৪১ সালের ৭মে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হলে স্ট্যালিন স্বয়ং নাৎসী জার্মানীর অগ্রাভিযানের মুখে যুদ্ধ পরিচলনা করেন। দেশের পক্ষে দাঁড়িয়ে মহান মানবিক তাগ স্বীকারের মাধ্যমে স্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধে তিনি জার্মান বাহিনীর অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করতে সক্ষম হন। স্ট্যালিন ১৯৪৩ সালে তেহরানে অনুষ্ঠিত মিত্র শক্তির সভায় যোগদান করেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের অ-সমাজতন্ত্রী মিত্রদের প্রতি শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ

কমিনটার্ণ (কমিনিষ্ট ইন্টারন্যাশনাল) ভেঙ্গে দেন। ১৯৪৫ সালে ইয়াল্টা এবং পোস্টডাম সভায় যোগদানের মাধ্যমে স্ট্যালিন পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত প্রভাব বিস্তারের স্বীকৃতি আদায় করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে তিনি সোভিয়েত সেনাবাহিনী কর্তৃক মুক্ত হওয়া দেশসমূহে সাম্যবাদী কর্তৃত্বের প্রসার ঘটান। তা সত্ত্বেও, পঞ্চাশের দশকে স্নায়ু যুদ্ধের সুচনার ফলে পাশ্চাত্বের অনুসৃত বৈরী নীতিমালার বিপরীতে তাঁর করণীয় অনেক কিছুই অবশিষ্ট থেকে যায়। শেষ বয়সে স্ট্যালিন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত এবং শারিরীকভাবে দূর্বল হয়ে পড়েন। আর সে সময়েই তিনি ইহুদি বিরোধী আরেকটি নতুন অভিযান শুরু করেন। তিনি ১৯৫৩ সালের জানুয়ারী মাসে মস্কোয় অবস্থিত বহু ইহুদি ডাক্তারকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ প্রদান এবং বিষাক্ত ঔষুধ প্রয়োগে তাদের মৃত্যুদন্ডের বিধান জারি করেন। সুদীর্ঘ ৩০ বছর একটানা শাসন অব্যাহত রাখার পর ১৯৫৩ সালের ৫ মার্চ বিমান দুর্ঘটনায় স্ট্যালিনের আকস্মিক মৃত্যু মস্কোতে আরো একটি রক্তক্ষয়ী ঘটনার জন্ম দেয়।

স্ট্যালিনের মুত্যুর পর তাঁর উত্তরসূরীরা তাঁকে 'ব্যক্তি পুঁজা' সৃষ্টির অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। তাঁর মৃত্যুর তিন বছর পর স্ট্যালিনের অধিকাংশ কার্যক্রম বিংশতম দলীয় কংগ্রেসে বাতিল ঘোষিত হয়। ১৯৬১ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত পার্টির ২২তম কংগ্রেসে তাঁকে বর্জনের সিদ্ধান্ত গৃহীত এবং ক্রেমলিনের পার্শ্ববর্তী রেড স্কোয়ার থেকে তাঁর মমিকৃত মৃতদেহ অপসারণ করা হয়। তাঁর রাজনৈতিক উত্তরসূরীরা তাঁর নাম ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলতে চাইলেও স্ট্যালিনের সুদীর্ঘ শাসনামলে তাঁর অর্জিত সাফল্যকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। রুশ কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব প্রদান থেকে শুরু করে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে দেশরক্ষা প্রভৃতি ঘটনা অসামান্য সাফল্যেরই খতিয়ান। অনেকের ধারণা, স্ট্যালিনের উত্তরসূরীরা তাঁরই নীতি আদর্শে অটল থাকলে সোভেয়েত ইউনিয়ন তথা রুশ সমাজতন্ত্রের পতনকে হয়তবা প্রতিহত করা যেত।

সারকথা

একটি শক্তিশালী জাতির লৌহমানব হিসেবে খ্যাত স্ট্যালিন সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিহাসে একজন বিতর্কিত নেতা হিসেবে অমর হয়ে আছেন। সোভিয়েত ঐতিহাসিকগণ স্ট্যালিনের শাসনামলকে অত্যন্ত সফল হিসেবে চিহ্নিত করলেও পাশ্চাত্য পন্ডিতগণ তাঁর শাসনামলের রক্তাক্ত ঘটনাবলীকে বড় করে দেখেন। তবে এটাও ঠিক যে, স্ট্যালিনের মত একজন কর্তৃত্ববাদী শাসকের উপস্থিতি ছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক বিকাশ কতটা সম্ভব হত সেটি প্রশ্নসাপেক্ষ ব্যাপার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে (✓) টিক চিহ্ন দিন।

১। লেনিনের মৃত্যুর পর কার সাথে স্ট্যালিনের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দেয়?

ক) লিও ট্রটস্কি; খ) প্লেখানভ;

গ) জেকভ ভারডলভ; ঘ) জেনারেল ডেনিকিন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। স্ট্যালিনকে কেন লৌহমানব বলা হয়?

২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্ট্যালিনের ভূমিকা কি ছিল?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। স্ট্যালিনের রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন।

সঠিক উত্তর ঃ ১। ক

পাঠ - ৪

মাও জে ডং (১৮৭২-১৯৭৬)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- ❑ মাও জে ডং-এর রাজনৈতিক চিন্তাধারা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ❑ মাও কর্তৃক গৃহীত পাদক্ষেপসমূহ আলোচনা করতে পারবেন।

চীনা কমিউনিষ্ট আন্দোলনের অন্যতম নেতা মাও সেতুং (বর্তমান সংস্করণ মাও জে ডং) ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রধান স্থপতি। তিনি হুনান প্রদেশে শাওশান গ্রামে ১৮৯৩ সালের ২৬ ডিসেম্বর এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ প্রতিভা আর পরিশ্রমের গুণে বিকশিত হন তিনি। যৌবনের শুরুতে তিনি মাঞ্চু সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে (১৯১১-১২) ন্যাশনাষ্টি আর্মির পক্ষে যুদ্ধ করেন। ১৯১৮ সালে তিনি হুনানের চাংশা শিক্ষক প্রশিক্ষণ একাডেমি থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জনের পর বেইজিং বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী গ্রন্থাগরিকের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। সে সময় তিনি নয়া পাশ্চাত্য চিন্তাধারা তথা মার্কসবাদী দর্শনের সংস্পর্শে আসেন।

১৯২০ সালে মাও জে ডং চাংশা ফিরে আসেন এবং একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদে যোগদান করেন। তাঁর প্রস্পাবিত গণশিক্ষা কর্মসূচী সরকার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হলে তিনি একজন আত্মনিবেদিত মার্কসবাদী হয়ে উঠেন এবং সাংহাই কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসে যোগদান পূর্বক চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির গোড়াপত্তনের সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করেন। ১৯২৩ সালে স্থানীয় যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে কমিউনিষ্ট পার্টি চীনের জাতীয়তাবাদী নেতা সান ইয়াৎ সেনের কুয়োমিনতাং (যার অর্থ জাতীয় জনদল)-এর সাথে একাত্ম হলে মাও জে ডং হুনান কৃষকদের সংগঠিত করার কাজে পুরোমাত্রায় রাজনৈতিক কর্মী বনে যান। রুশ মেনশেভিক ধারা মতো তিনি অনুধাবন করেন যে, চীনের মতো আধা সামন্ততান্তিক ও আধা উপনিবেশিক দেশে দরিদ্র চাষীরাই বিপ্লব সংগঠনে প্রধান শক্তি হিসেবে কাজ করবে। সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবী তত্ত্বের সাথে 'আধা উপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী' সমাজ ব্যবস্থায় 'জনগণতান্তিক' বিপ্লবের তত্ত্ব দিয়ে তিনি মার্কসবাদ লেলিনবাদদের সঙ্গে নতুন মাত্রায় সংযোজন করেন।

তাঁর নিজ প্রদেশ হুনানে দরিদ্র চাষীদের জেগে উঠতে দেখে ১৯২৭ সালের শুরুতে 'রিপোর্ট অব দ্য পেজেন্ট মুভমেন্ট ইন হুনান' বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেন। এতে তিনি যুক্ত প্রদর্শন করেন যে, কৃষকরা হল চীনের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের এক অপরিমিত শক্তি এবং এশক্তিকে কমিউনিস্টদের সমর্থন জানানো প্রয়োজন। তাঁর এই পরামর্শের জন্য মস্কোভিত্তিক কুমিনটার্ণ (কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল) মাও-এর বিরুদ্ধে 'বামপন্থা'র অভিযোগ আনে এবং চীনের ক্ষমতাসীন চীয়াং কাইশেক স্বয়ং সোভিয়েত প্রভাবকে পরিহার কররে চীনা কমিউনিষ্টদের সাথে তাঁর মিত্রতা ভেঙ্গে পড়ে। এমতাবস্থায়, ১৯৩১ সালে মাও জে ডং নয়া চায়না-সোভিয়েত রিপাবলিক আন্দোলনের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং কমিউনিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটির শহর ভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তোলার সাথে দ্বি-মত পোষণ করেন। কুয়োমিনতাং সরাকার একের পর এক কমিউনিষ্ট নেতৃত্বে পরিচালিত শহুরে অভ্যুথান দমন করতে থাকলে মাও জে ডং এর কৃষক নির্ভর আন্দোলন পরিচালনার বিষয়টি কমিউনিস্টদের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠে। অবশ্য, চিয়াং কাইশকে সরকার কৃষকদের 'এটাম হার্ভেষ্ট' অভ্যুথানকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিরোধ করলে মাও জে ডং ঝিয়াংজি পাহাড়ে আশ্রয় নেন এবং যুদ্ধবাজ চুতেহ এর সহযোগিতায় বিপ্লবী গেরিলা লালফৌজ গড়ে তোলার মাধ্যমে কৃষকদের মধ্যে কমিউনিষ্ট প্রভাব অক্ষুন্ন রাখেন। ফরে চীনের জটিল ক্ষমতা কাঠামোর অভ্যন্তরে কৃষক মিলিশিয়াদের প্রভাবকে উপেক্ষা করে কমিউষ্টিদের কাজ করা অনেকটা সহজ হয়ে আসে।

পক্ষান্তরে, ১৯৩০-৩৪ সালে চীয়াং কাইশেকের সেনাবাহিনী দফায় দফায় চীনের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে কিয়াংসি প্রদেশে অভিযান চালিয়ে কমিউনিষ্ট ঘাটিগুলোতে বেষ্টনী তৈরী করে তাদের প্রভাব বিস্তারকারী এলাকা থেকে বিতাড়িত করতে থাকে। এমতাবস্থায় চীনা কমিউনিষ্ট পার্টি দলের অভ্যন্তরে বাম হটকারীদের প্রভাবে মাও-এর গেরিলা যুদ্ধের কৌশল পরিহারপূর্বক কমিউনিষ্টদের সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হওয়ার নির্দেশ প্রদান করে। মাও-কে দলের নেতৃত্বের পদ থেকে সাময়িকভাবে অপসারিত হতে হয় একই সময়ে। যুদ্ধে উন্নত অস্ত্রের অধিকারী

চীয়াং কাইশেক বাহিনীর হাতে কমিউনিষ্ট বাহিনীর চরম পরাজয় ঘটে এবং হাজার হাজর লালফৌজ মৃতুবরণ করে। কুয়োমিনতাং বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়ে মাও জে ডং ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে উত্তর-পশ্চিমের সেনসি প্রদেশের দিকে লালফৌজদের নিয়ে কৌশলগত পশ্চাদপসরণ শুরু করেন। ইতিহাসে এই অভিযাত্রা চীনা 'লং মার্চ' নামে খ্যাত। পথিমধ্যে সরকারী বাহিনীর সাথে বহু সংঘর্ষ মোকাবেলা করে প্রায় ১২,৫০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে চীনা লাল ফৌজদের সেনশি পৌছাতে এক বছর সময় লেগে যায়। অবশ্য হুনান, হুপে প্রভৃতি এলাকা থেকে লালফৌজদের এখানে পৌছাতে আরো এক বছর অতিরিক্ত সময় লেগে যায়। অবশ্য হুনান, হুপে প্রভৃতি এলাকাতে থেকে লালফৌজদের এখানে পৌছাতে আরো এক বছর অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হয়। মাও পরিচালিত এই লং মার্চ লালফৌজদের কেবল অকাল ধ্বংসের হাত থেকেই রক্ষা করেনি, বরং চলার পথে বিজয়ের পর বিজয় অর্জনের মাধ্যমে কুয়োমিনতাং বাহিনীর মনোবল বহুলাংশে ভেঙ্গে দিতে সমর্থ হয়। লং মার্চ ব্যাপক এলাকার জনগণকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে এবং মুক্তাঞ্চল সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণ ও কমিউনিষ্ট ক্যাডারদের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরী করে। এই সুদীর্ঘ পদযাত্রা প্রকৃত কমিউনিষ্ট ক্যাডারদের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরী এবং প্রকৃত কমিউনিষ্টদের জন্যে এক অগ্নিপরীক্ষা হিসেবে কাজ করে। সর্বোপরি, লং মার্চের মধ্য দিয়ে মাও জে ডং কমিউনিষ্ট পার্টির চেয়ারম্যান ও অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। মাও গেরিলা যুদ্ধ ও রণকৌশল উদ্ভাবনের মাধ্যমে মার্কসীয় বিপ্লব তত্ত্বের ক্ষেত্রে এক মৌরিক অবদান রেখে যান। ১৯৪৫ সালে মাও জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। এ পর্বে বিপ্লবী কমিউনিষ্টরা চীনের অনেক অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানীদের আত্মসমর্পণের পর ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে চীয়াং কাউশেক বাহিনী এবং কমিউনিষ্টদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। এই গৃহযুদ্ধে ১৯৪৯ সালে মাও-এর নেতৃত্বে চীনের মূল ভূখন্ডে কমিউনিষ্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং চীয়াং কাইশেকের কুয়োমিনটাং সরকার তাইওয়ানে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয়। একই বছরের ১ অক্টোবর মাও জে ডং চীনকে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন ঘোষণা করে নিজে সে সরকারের চেয়াম্যান পদ গ্রহণ করেন।

ক্ষমতা গ্রহণের পর মাও জে ডং জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুসংহত এবং জনগণের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে জনগণের রাষ্ট্রযন্ত্রকে সুদৃঢ় করার পরিকল্পনা নেন। তিনি প্রথমত চীনে সোভিয়েত ইউনিয়ন ধাঁচের সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার লক্ষ্যে ভুমি সংস্কার, ভারী শিল্প কারখানা স্থাপন এবং আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণের প্রতি মনোযোগী হন। কিন্তু সানঝি অবস্থানকালে কৃষকদের সাথে সংশ্রবের ভিতর দিয়ে চীনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের প্রতি তিনি মনোযোগী হয়ে উঠেন। ফলশ্রুতিতে সোভিয়েত মডেলের বিকল্প হিসেবে চীনা সাম্যবাদ গড়ে তোলায় তিনি তৎপর হন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি আধুনিক শিল্পায়িত সমবায় পদ্ধতির চাইতে স্থানীয় উদ্যোগে শ্রম নির্ভর স্বনির্ভর কর্মসূচীর প্রতি গুরুত্বরোপ করেন। তাঁর মতে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই যথেষ্ট নয়, রাজনীতি ও আদর্শের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পূর্নাঙ্গ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদন করা প্রয়োজন। আর সে লক্ষ্যে পরিচালিত সংগ্রাম অত্যন্ত দীর্ঘকাল ধরেই অব্যাহত থাকবে বলে তাঁর ধারণা।

রাজনৈতিকভাবে তিনি যে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের ধারণা বিকশিত করেন তাতে বুদ্ধিজীবি, কৃষক, গেরিলা নেতা সবাই আর্থ-সামাজিক কৌশলের সাথে একাত্ম হয়ে সমাজতন্ত্রে পৌছানোর লক্ষ্যে দ্রুততম পথ উদ্ভাবনে সক্ষম হবে বলে তাঁর ধারণা। ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে স্ট্যালিনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের নীতি অনুসৃত হলে এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে মাও জে ডং চীনে 'শত ফুল ফুটতে দাও' নীতির আওতায় বুদ্ধিজীবিদের কাছ থেকে আমলাতন্ত্র ও প্রশাসনের সমালোচনা আহবান করেন। কিন্তু চীনা বুদ্ধিজীবিরা এ সুযোগে আমলাতন্ত্রের সমালোচনা আহবান করেন। কিন্তু চীনা বুদ্ধিজীবিদের কাছ থেকে আমলাতন্ত্র ও প্রশাসনের যৌক্তিকতা এমনকি মাও-এর ব্যক্তিগত সমালোচনায় মূখর হয়ে উঠে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৮ সালে তিনি 'বৃহৎ উল্লম্ফন কর্মসূচী' নীতিমালার মাধ্যমে আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত কমিউনের মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত করার উদ্দ্যোগ গ্রহণ করেন। কমিউনের সকল সদস্যদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এবং তাদের ইচ্ছার ভিত্তিতে স্থানীয় উৎপাদন, বণ্টন উন্নয়ন, প্রশাসন প্রভৃতি পরিচালনার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। কিন্তু প্রশাসনিক স্থবিরতার কারণে মাও - এর 'বৃহৎ এবং জনগণের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। অনেকে মাও ও তাঁর অনুসারীদের সমালোচনামূখর হয়ে উঠেন । পক্ষান্তরে, মধ্যপন্থীরা এই ব্যর্থতার জন্য 'দল ও সরকারের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা ধনতন্ত্রী ও বিচ্যুতদের দায়ী করেন। অবশ্য, ১৯৫৭ সালে জনগণের মধ্যকার দ্বন্দ্বের সঠিক পরিচর্যা' বিষয়ক বক্তৃতায় মও সমাজতান্ত্রিক সমাজের অভ্যন্তরে এই ধরনের সংঘাতকে অনিবার্য ও ইতিবাচক হিসেবে মতামত প্রদান করেন।

১৯৫৯ সালে মাও জে ডং রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন এবং সরকার ও কমিউষ্টি পার্টির নিয়ন্ত্রণ কার্যত: নিজের হাতেই রেখে দেন। সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের দ্বন্দ্ব ও স্ববিরতার প্রেক্ষাপটে মাও জে ডং ১৯৬৫ সালে লিন পিয়াও-এর নেতৃত্বাধীন পিপলস লিবারেশন আর্মির সহায়তায় পাটি, সরকার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ সকল পর্যায় থেকে বিরুদ্ধবাদীদের উচ্ছেদ অভিযান শুরু করেন। এই অভিযানই চীনের ইতিহাসে 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব' নামে খ্যাত। ১৯৬৬ সালের মাঝে এই বিপ্লব সমগ্র চীনে ছড়িয়ে পড়ে। মাও জে ডং এর চিন্তাধারা সম্বলিত ছোট্ট 'লাল নোট বই' এ সময় চীনসহ তৃতীয় বিশ্বের নানা দেশে গসপেলের মর্যাদা পায়। মাওয়ের চিন্তাধারা আলোকে তাঁর সমর্থক বুর্জোয়া মতবাদপুষ্ট ও বিপ্লবী চিন্তাধারার পরিপন্থী হিসেবে কথিত অসংখ্য নেতা-কর্মী ও কর্মচারী এ সময় কর্মচ্যুত, এমনকি নিহত হয়। ক্ষেত্রবিশেষ রেড গার্ডরা ব্যক্তিস্বার্থে ও ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটানোর হাতিয়ার হিসেবে সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে ব্যবহার করে। ১৯৬৮ সালে চীনের রাষ্ট্র প্রধান, লং মার্চের সময়কার অন্যতম তাত্ত্বিক নেতা, 'হাউ টু বি এ গুড কমিউনিষ্ট' গ্রন্থের প্রণেতা লিও শাও চি-কেও একই অভিযোগে রাষ্ট্র ও দলের সকল পদ থেকে অপসারণ করা হয় । এই সময়েই বহিষ্কৃত হন দেং জিয়াং পিং-সহ আরো অনেক নেতৃবৃন্দ।

১৯৬৯ সালের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রধান নেতা লিন পিয়াওকে মাও-এর উত্তরাধিকারী মনোনীত করা হয়। ১৯৭০ সালে মাও-কে সার্বোচ্চ কমান্ডারের পদে বসানো হলে তিনি তার উগ্রপন্থী ও উদারপন্থী অনুসারীদের মধ্যে ভারসাম্য আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাদের সম্পর্ক মনকষাকষির পর্যায়েই থেকে যায়। ১৯৭১ সালের মধ্যে লিন পিয়াও ক্ষমতা থেকে অপসারিত হন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে পালানোর পথে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন। ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ সালে মাও বেইজিং -এর মৃত্যুবরণ করেন। মাওয়ের মুত্যুর পর ক্ষমতা দখলকারী দেং জিয়াও পিং পন্থীরা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তীব্র সমালোচনা করেন। নতুন সরকার লিও শাও চিসহ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ফরে নিগৃহীত সবাইকে সসম্মানে পুনর্বাসন এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মন্ত্রনাদাতা চার নেতাকে 'চার কুচক্রী' হিসেবে শাস্তি প্রদান করে।

সারকথা

চীনা কমিউনিষ্ট নেতা মও জে ডং গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের অন্যতম প্রধান স্থপতি। কার্ল মার্কস ও লেনিনের পাশাপাশি তাঁকে মার্কসবাদী দর্শনের অন্যতম মহান তাত্ত্বিক হিসেবে গণ্য করা হয়। এশিয়ার পরিস্থিতিতে কৃষকদের বিপ্লবী শক্তি আবিষ্কার ও গেরিলা যুদ্ধের করা-কৌশল উদ্ভাবনের মাধ্যমে মাও জে ডং মার্কসবাদ-লেনিনবাদী বিপ্লবী তত্ত্বকে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সাফল্যের স্বাক্ষর রাখেন। দীর্ঘ ২৭ বছর গণপ্রজাতন্ত্রী চীন শাসনের মাধ্য দিয়ে তিনি বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে অন্যতম নেতার আসনে অধিষ্ঠিত হন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে (✓) টিক চিহ্ন দিন।

১। মাও জে ডং কখন মার্কসবাদী চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন?

ক) চাংশা শিক্ষক প্রশিক্ষণ একাডেমিতে পড়াশুনাকালে;

খ) চাংশা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার সময়;

গ) বেইজিং বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব পালনকালে;

ঘ) চীনের জাতীয়তাবাদী নেতা সান ইয়াৎ সেনের সাহচর্যে।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। চীনা লং মার্চ কি?

২। 'শত ফুল ফুটতে দাও' এর তাৎপর্য কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। একজন চীন কমিউনিষ্ট নেতা হিসেবে মাও জে ডং এর উত্থান ও বিকাশ পর্যালোচনা করুন।

সঠিক উত্তর :

১। গ

সহায়ক গ্রন্থ

১। মুহাম্মদ আয়েশ উদ্দীন, রাষ্ট্রচিন্তা পরিচিতি, মৌসুমী পাবলিকেশন রাজশাহী, ১৯৯৮

২। আলাউদ্দিন খান, রাষ্ট্র ও খিলাফত, ই, ফা, বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৬

৩। এ জেড এম শামসুল আলম, ইসলামী রাষ্ট্র, খোশরোজ কিতাব মহল লি., ঢাকা ১৯৮১

৪। সৈয়দ মুকসুদ আলী, রাজনীতি ও রাষ্ট্রচিন্তায় উপমহাদেশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৮

৫। মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ ও তার রাজনৈতিক চিন্তাধারা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯২

৬। ডঃ এম হুদা, মুসলিম দর্শনের মূলতত্ত্ব ইউরেকা বুক হাউস ঢাকা ১৯৯৬

৭। মওলানা মুহাম্মদ আব্দর রহীম, আল কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার খায়রুন প্রকাশনী ঢাকা ১৯৯৫

৮। ডঃ এমাজউদ্দিন আহমেদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা, বাংলাদেশ বুকশ কর্পোরেশন, ১৯৮৫

৯। প্রাণগোবিন্দ দাশ, রাষ্ট্রচিন্তার ইতিবৃত্ত, কলিকাতা ১৯৮৮

১০। আবুল হাসিম, ইসলামের মর্মকথা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮১

১১। কে, বি, মোস্তফা, ইসলামের ইতিহাস, হাসান বুক হাউস, ঢাকা ১৯৯৩

১২। অধ্যাপক ইউনুস আলী দেওয়ান, অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচিতি, পূর্বদেশ পাবলিকেশন, ঢাকা ১৯৯৮